ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 975-981
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.313

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত গল্পে প্রান্তিকতা: একটি অন্বেষণ

রিয়া সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.02.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Marginality refers to the class outside the mainstream of society—those who have no economic power, no social power, and minimal ties with the state or power structures. Literarily, the image of marginality means a life full of crisis, where deprivation, hunger, despair, oppression, and the struggle for survival continue. In the first half of the 20th century, rural society in Bengal and the urban middle and lower classes faced social changes. Poverty among the lower classes took extreme forms due to industrialization, urbanization, economic recession, and the Great Depression. This social reality is reflected in the pens of writers. Premendra Mitra was one of those writers who combined humanity with reality. In his stories, we hear the pitiful cries of marginalized people, but at the same time we see the power of hope and resistance.

Premendra Mitra is a shining star in the history of Bengali short stories. He was a poet, novelist, screenwriter and short story writer all at once. In the thirties of the 20th century, when a new modernity was beginning in Bengali literature with the help of the Kallol era, Premendra Mitra's writings opened up new horizons of social reality. His stories depict the marginalized people of the city, the uprooted reality of life, poverty, despair, and at the same time the hidden dreams and indomitable vitality of the human heart. Premendra Mitra's short stories are not just stories, they are a mirror of sociology, where the life struggle of poor people, economic inequality, social oppression, and the tension between people are reflected. In his stories, these marginalized people are not just side characters, but they become the main subject of the story. Especially in 'Pistol', 'Samane Charai', 'Sangkranti' and 'Ponaghat Periye'—we see the intense reality of life and a subtle analysis of the mentality of marginalized people.

The realistic writer Premendra Mitra has depicted the lives of the lower-class people in his stories. Speaking of whom, Sarat Chandra says – 'Those who only give in the world and get nothing, those who are deprived, those who are weak, oppressed, those who are human beings but whose tears are never counted…' The characters of these marginalized, neglected people are presented with specific feelings in his stories.

Keywords: Marginal, Middle class, Oppression, Vitality, Social reality, Urbanization

অন্ত্যজ বা প্রান্তিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নীচজাতি' হলেও ব্যাপক অর্থে নিম্নবৃত্তধারী বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষদের বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে যেভাবেই প্রান্তিক মানুষদের চিহ্নিত

করা হোক না কেন চূরান্ত পর্যায়ে দেখা যায় এরা দীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষের কাছে এরা চিরদিনই উপেক্ষার পাত্র। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে 'নিম্নবর্গ' ধারণা বহুচর্চিত একটি বিষয় হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নজীবী মানুষের কথা বিশ শতক থেকেই লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। বাংলা সাহিত্যের সেরকমই একজন প্রথিতযশা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), যাঁর সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে একদিকে যেমন শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনই বারবার উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র। তাঁর গল্পে এই প্রান্তিক মানুষরা কেবল পার্শ্বচরিত্র নয়, বরং তারাই হয়ে উঠেছে গল্পের মূল উপজীব্য। তাদের দৈনন্দিন দুঃখ, বঞ্চনা, হতাশা এবং আত্মমর্যাদার লড়াই গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'পিস্তল' হল সমাজের প্রান্তিক ও দুস্থ মানুষের জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই গল্পে একটি জংশন স্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একদল পথশিশু, যুবক-যুবতী এবং তাদের নিত্যদিনের জীবন সং6গ্রাম বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে স্টেশনের চেহারা যেমন বদলে গিয়েছে, তেমনি বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনও। যুদ্ধের বাজারে এই স্টেশন হঠাৎই মিলিটারি কনট্রাক্টরের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে। একদিকে যেমন যুদ্ধের সরঞ্জাম বোঝাই মালগাড়ি চলাচল করে, তেমনি দেশি-বিদেশি সৈন্যদের আনাগোনাও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, মানুষের জীবনের মান ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। দুর্ভিক্ষ আর খাদ্যাভাবে আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা মানুষজনের ভিড়ে স্টেশন ভরে যায়।

> "পেটের জ্বালা নিবোতেই সারা দিনরাত চোখ দুটো জ্বেলে রেখে সজাগ থাকতে হয়। বড় কঠিন লড়াই। আশপাশের সমস্ত গাঁ ভেঙে মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো এসে স্টেশনে ভিড় করেছে- কোথাও এক দানা চাল নেই.... তাদের হাহাকারে স্টেশনে কান পাতা যায় না।"[১]

ট্রেনগুলোর ছাদে, দরজায়, জানালায় মানুষ ঝুলতে ঝুলতে চালের খোঁজে দূরদূরান্তে যায়, কিন্তু অনেকেই পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল নিধে, শ্যামা, বিনি, এবং আরও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা, যাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয় এই স্টেশন। তারা ভিখারি না হলেও সুযোগ পেলে চুরি করে, কিন্তু তারা নিজেদের চোর বলতে নারাজ। তারা নিজেদেরকে লোহা-লক্কড় ইঞ্জিন-মালগাড়ির এক নতুন জগতের বেদে বলে মনে করে। তাদের জীবন যেন "সময়ের অসীম স্রোতে প্রতি মুহূর্তের ঢেউয়ের উপরে তারা কোনোরকমে ভেসে থাকে,"[২] যেখানে সামনে বা পেছনের কোন হিসেব নেই। তাদের জীবনযাত্রা এতটাই অনিশ্চিত যে, যেকোনো মুহূর্তে কেউ হারিয়ে যেতে পারে, যেমনটা ঘটেছে বিনির ক্ষেত্রে। মালগাড়ির নিচে কাটা পড়ে বিনির মৃত্যু হয় এবং তার ছড়িয়ে পড়া চালের দানাগুলো অন্যরা কুড়িয়ে নেয়, যা তাদের জীবন সংগ্রামের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরে। গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র হল নিধে এবং শ্যামা। নিধে হল সেই 'বেদে' দলের একজন, যে ইংরেজ ও মার্কিনের মধ্যে পার্থক্য বোঝে এবং প্রয়োজন মতো তাদের কাছে থেকে খাবার ও পয়সা আদায় করতে পারে। সে অন্যদের থেকে অনেক বেশি চালাক ও সতর্ক, যেন 'খরগোশের মতো সতর্ক-ইঁদুরের মতো চালাক'। তার চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা যায়, বিশেষ করে লালমোহনের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, শ্যামা চরিত্রটি আরও গভীর। রোগা-কালো এবং 'হাড্ডিসার কাঠির মতো চেহারা' হলেও তার 'হাড়েরও একটা শ্রী ছিল'। সে অন্যদের থেকে আলাদা ছিল, কারণ তার মধ্যে এক ধরনের আত্মসম্মানবোধ ছিল। সে তার ছেঁড়া কাপড় এমনভাবে পরত যাতে গেরো ও তালি চোখে না পড়ে। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তার চোখ, যা সাপের মতো জ্বলজ্বলে ছিল। শ্যামা যেন এই প্রান্তিক সমাজে টিকে থাকার জন্য এক লড়াইয়ের প্রতীক। সে পয়সা না পেলে সহজে হার মানত না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেও লালমোহনের শিকার

হয় এবং জীবন যুদ্ধে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ে, যেমনটা গল্পকার লিখেছেন- "কালসাপ এখনো একেবারে মরে যায়নি, সবে খোলস ছেড়ে এসে শুধু নেতিয়ে পড়েছে।"[৩]

গল্পে লালমোহন চরিত্রটি ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতীক। সে একজন সাধারণ আড়কাঠি থেকে ফতেচাঁদ সিন্ধির গুদামের প্রধান কর্মকর্তা হয়ে ওঠে। তার হাতে এখন হাজার হাজার কুলির জীবন-মরণ। তার এই ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার হয় সমাজের অসহায় মানুষেরা, বিশেষ করে মেয়েরা। সে 'ভিখিরি মেয়েদের সঙ্গে দুটো ফষ্টিনষ্টি করবার' জন্য ঘুরে বেড়াত এবং তার সুনাম কারও অজানা ছিল না। নিধে ও তার দলবলের কর্মকাণ্ডে লালমোহনের জাতক্রোধ ছিল, কারণ তারা তার অপকর্মের মুখোশ খুলে দিত। তার হাতে ছকার মতো সরল ছেলেকে চুরি আর মারধোরের শিকার হতে হয়।

গল্পের শেষ দৃশ্যে নিধে শ্যামাকে একটি পিস্তল দেয়, যা গল্পের নামকে সার্থক করে তোলে। এই পিস্তল কেবল একটি বস্তু নয়, এটি হল অসহায় মানুষের ক্ষোভ, ক্রোধ, এবং প্রতিবাদের প্রতীক। শ্যামা যখন এটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠে, তখন তা যেন তার আত্মরক্ষার এক নতুন আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। গল্পটি শেষ হয় এক করুণ দৃশ্যে— শ্যামা রাস্তার ধারে বসে বুক চেপে ধরে কাশছে, তার আঁচলে একদিকে চালের পুঁটুলি আর অন্যদিকে নিধের দেওয়া সেই পিস্তল। এই চাল তাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, আর পিস্তলটি তাদের প্রতিবাদের নীরব প্রতীক। সব মিলিয়ে, 'পিস্তল' গল্পটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক অসাধারণ সৃষ্টি, যা প্রান্তিক মানুষের জীবন, তাদের সংগ্রাম, আশা, হতাশা এবং প্রতিরোধের এক মর্মস্পর্শী চিত্রকে তুলে ধরে। গল্পটি যুদ্ধের বাজারে সমাজের করুণ অবস্থাকে তুলে ধরেছে, যেখানে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে এবং ক্ষমতাবানদের হাতে নিপীড়িত হয়।

'সামনে চড়াই' গল্পটি শুধু একটি কাহিনি নয়, এটি এক গভীর আদর্শের প্রতিচ্ছবি যা জীবনের কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই গল্পে মহিমদা নামের এক বিপ্লবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রকৃত সংগ্রাম শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক ও শোষিত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা। গল্পের শুরুতেই আমরা মহিমদার সঙ্গে গল্পের কথক লোকেশের আকস্মিক পুর্নমিলন দেখি। এক সময়ের বিপ্লবী মহিমদাকে এখন দেখা যায় এক চালের কলের ম্যানেজার হিসেবে, যা তার পূর্ব পরিচয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। তার পুরোনো পরিচয় ছিল এক দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক, যার নাম শুনলে অদ্ভুত শিহরণ জাগত। পুলিশও তার মাথার দাম ১০ হাজার টাকা ধার্য করেছিল। কিন্তু, সেই জীবনকে পেছনে ফেলে তিনি এখন এক সাধারণ, সাদাসিধে মানুষ। তার স্ত্রী বোবা এবং তাদের সংসার অত্যন্ত দরিদ্র। এই পরিবর্তন দেখে কথকের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন একজন বিপ্লবী এমন সাধারণ জীবনে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মহিমদা তার জীবনের নতুন দর্শনের কথা বলেন। একসময় তিনি বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, সত্যিকারের লড়াই কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং আত্মসম্মান হারানোর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, গরিব মানুষরা "নির্লজ্জভাবে পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভিক্ষে করে বড় লোককে অমানুষ করে তোলে,"[৪] এবং এতে তাদের আত্মসম্মান নষ্ট হয়। মহিমদা বিশ্বাস করেন, এমন মানুষদের খুঁজে বের করতে হবে, যাদের মধ্যে এখনও আত্মসম্মানের বীজ বেঁচে আছে। সেই বীজকে আবার নতুন করে পাথুরে জমিতে রোপণ করতে হবে। এই নতুন আদর্শে, মহিমদা এখন চালের কলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন, কারণ এটি তাকে প্রান্তিক মানুষের কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দেয়। তিনি কঠোরভাবে চাষীদেরকে সাহায্য চাইতে নিরুৎসাহিত করেন এবং তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেন। গল্পের শেষে,

মহিমদার এই নতুন সংগ্রামকে এক 'নতুন করে ছক পাল্টানো' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি নিজে বড়ের চাল না চললেও সেইসব ছোট ছোট 'বড়ে'দের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চান। এভাবে, 'সামনে চড়াই' গল্পটি বিপ্লবের এক নতুন সংজ্ঞা দেয়। এটি দেখায় যে, সত্যিকারের বিপ্লব শুধু বড় বড় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনার এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। গল্পটির শিরোনাম 'সামনে চড়াই' প্রতীকী অর্থ বহন করে— রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সামনে যে কঠিন পথ পড়ে আছে, তা হল সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষকে উপরে তোলার সংগ্রাম। মহিমদার চরিত্রটি সেই সংগ্রামেরই প্রতীক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী, যিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের জীবন অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে ফুটে উঠেছে। এই মানুষগুলি শুধু দারিদ্র্যের শিকার নয়, বরং সামাজিক অবহেলা, ঘৃণা ও অপমানেরও শিকার। 'সংক্রান্তি' গল্পটি এই ধরনের চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে অখিল নামক এক যুবকের জীবন, তার অসহায়তা এবং সমাজের নিষ্ঠুরতা এক মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র অখিল যেন এক চলমান লাঞ্ছনার প্রতিচ্ছবি। সে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নয়, বরং তার সামাজিক সম্মানও তলানিতে ঠেকেছে। মেসের ভাড়া বাকি থাকায় এবং তার নিত্যদিনের অসহায়তার কারণে সে বুড়ো হাঁপানি রোগীর (পূর্ণবাবু) কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়। বুড়ো তাকে 'বেহায়া লোক' বলে গালি দেয়, তার জ্বরকে মিথ্যা আখ্যা দেয়, এবং তার সামান্য ভাতের থালা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। অখিলের এই অসম্মান শুধু বুড়োর কাছেই সীমাবদ্ধ নয়। মেসের ঝি, যার নিত্যদিনের কলহ তার কানে আসে, এবং মেসের ঠাকুরও তাকে ছোটলোক বলে সম্বোধন করে। ঠাকুর তার ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাকে কাজের সময় গোলমাল করতে বারণ করে, এবং তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে আরও অপমানিত করে। এই সমস্ত ঘটনা অখিলকে আরও কোণঠাসা করে তোলে, এবং সে নিরুপায় ক্রোধে ফুঁসতে থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অখিলের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মানসিক যন্ত্রণাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অখিলের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপমান, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শৈশবে তার মামাতো বোনের বিয়ের সময় বরপক্ষীয়দের সামনে বলা একটি সত্য কথা, যা তাকে সূঁচের মতো বিঁধেছিল। তা তার মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে রেখেছে। এই ধরনের ছোট ছোট, তুচ্ছ অপমানগুলি তার মনে জমা হয়ে এক নিষ্ফল অভিমান ও সংসারের প্রতি বীতরাগ তৈরি করেছে। একসময় এক তরুণীর এক ঝলক স্নিগ্ধ ও নিষ্পাপ চাহনি তাকে জীবনের প্রতি নতুন করে আশাবাদী করে তোলে। সে তখন লিখেছিল,

> "আমায় অনেক দুঃখ দিলে দেবতা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক বঞ্চনার বেদনা; কিন্তু এইটুকুর জন্যে আজ তোমায় প্রণাম করছি।"[৫]

কিন্তু সেই স্নিগ্ধতাও মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, যখন তরুণীর বর্ষীয়সী মা তাকে 'ছোটলোক' বলে গালি দেয় এবং মেসের লোকজনের কাছে তার সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনা অখিলকে এতটাই ভেঙে দেয় যে সে লজ্জায়, ঘৃণায় ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেস থেকে পালিয়ে যায়।

গল্পে আরও অনেক প্রান্তিক চরিত্রের উল্লেখ আছে যারা অখিলের মতোই অসহায়তার শিকার। পাওনাদার দর্জি, যার পাওনা মাত্র দশ আনা পয়সা, সেও অখিলকে তাড়া করে এবং প্রকাশ্যে অপমান করে। অখিলের বন্ধু, যার কাছে সে কুড়ি টাকা ধার করেছিল, সেও তাকে নীরব অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে চলে যায়। এমনকি যখন অখিল তার কাছে একটি টাকা ভিক্ষা করে, তখন সে তাকে ভর্ৎসনা করে। এই প্রতিটি চরিত্র যেন সমাজের সেই দিকটিকে তুলে ধরে যেখানে মানবিকতা শুধু অর্থ ও প্রতিপত্তির ওপর নির্ভরশীল। জীবনের শেষ

মুহূর্তেও, যখন অখিল আফিম খেয়ে জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার বন্ধু, মেসের সহকর্মী, এমনকি পথচারী মজুররাও তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। সমাজের এই নির্মম দিকটিই প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অখিল যখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার ছবির চিঠি তাকে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আফিমের প্রভাবে তার শরীর শিথিল হয়ে আসছিল এবং সে জ্ঞান হারাতে শুরু করে। তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ সমাজের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না। এই গল্পে, লেখক প্রান্তিক মানুষের অসহায়তা ও একাকিত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তা পাঠকের মনে গভীর দাগ ফেলে যায়।

'সংক্রান্তি' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র অখিল নামক এক প্রান্তিক চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের নির্মম দিকটি তুলে ধরেছেন। এই গল্পে দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান এবং মানুষের অসহযোগিতার এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনী এই প্রান্তিক মানুষের প্রতি এক গভীর সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়, এবং তাদের যন্ত্রণার ভাষাহীন আর্তনাদকে এক শক্তিশালী রূপ দেয়।

'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলাই, যে সমাজের চোখে একজন ব্যর্থ, ভবঘুরে এবং নেশাগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকে কেবল এই পরিচয়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি। গল্প যত এগোয়, ততই তার চরিত্রের গভীরতা উন্মোচিত হয়। সে একজন ঘরজামাই, যার কোনও কাজ নেই। শাশুড়ি তাকে 'বকাটে' এবং 'ভীমরতি' ধরা জামাই হিসেবে দেখেন। স্ত্রী চপলাও তাকে ঘৃণা করে, কারণ সে একজন ভবঘুরে এবং নেশাখোর। সমাজের চোখে সে একজন অপদার্থ, যে চাকরি হারিয়েছে একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু অদল-বদল করার মতো সামান্য ভুলের জন্য। কিন্তু বলাইয়ের নির্বিকার মুখ, তার তাচ্ছিল্যভরা হাসি এবং প্রখর আত্মমর্যাদা তাকে এক ভিন্ন মাত্রায় স্থাপন করে। সে জানে সমাজের চোখে তার কোনো মূল্য নেই, তাই সে প্রচলিত সমাজের নিয়ম-কানুন বা মর্যাদার তোয়াক্কা করে না। যখন তার শাশুড়ি তাকে তিরস্কার করে, তখন সে হাসে এবং রসিকতা করে। বলাইয়ের চরিত্রটি কেবল তার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে গঠিত নয়। তার চারপাশে থাকা মানুষগুলোও প্রান্তিক সমাজেরই অংশ। গরুর গাড়ির চালক মেহরারু, ওসমান, জীয়ুৎ— এরা সবাই কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীর দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লেখক দেখান, কিভাবে এক সময়ের খরস্রোতা নদী এখন 'হাঁটু পর্যন্ত জল' ধারণ করে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দুর্দশারই প্রতীক। বলাইয়ের কথায় সেই হতাশা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে বলে, "শহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে লোকে বাড়ি করবে?"[৬] তার এই উক্তি কেবল তার নিজস্ব হতাশা নয়, বরং তা সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিফলন। তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও গভীরতা প্রকাশ করে, যেমন "ঐ কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে, তা জানিস?"[৭] এটি প্রমাণ করে যে সমাজের নিম্নস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার দৃষ্টি দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর রয়েছে।

গল্পে খোঁড়াবাবুর চরিত্রটি শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। সে সমাজের সেই অংশ, যারা সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ায়। বলাইয়ের সঙ্গে তার বিরোধ কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা সমাজের দুই বিপরীত শ্রেণির সংঘাত। খোঁড়াবাবু যখন বলাইকে 'বেপরোয়া ঘাড়ধাক্কা' দেয়, তখন তা কেবল এক ব্যক্তির ওপর আরেক ব্যক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন নয়, বরং তা প্রান্তিক মানুষের প্রতি শোষক শ্রেণির চরম অবজ্ঞার প্রকাশ। বলাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার পদ্ধতিটি প্রতীকী। সে সরাসরি মারামারি বা বাগ্‌বিতণ্ডায় না গিয়ে খোঁড়াবাবুর নতুন খড়ের গোলায় আগুন দেয়। এই আগুন কেবল একটি গোলা ধ্বংস করে না, বরং তা প্রান্তিক মানুষের চাপা রাগ, হতাশা এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি তাদের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

বলাই বলে, "দেখলি সেলাম? নেশাখোর মানুষ-আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!"[৮] এই উক্তিটি বলাইয়ের নিজস্ব দর্শনকে তুলে ধরে— প্রচলিত সমাজের প্রতি তার ঘৃণা এবং প্রতিবাদ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে তথাকথিত 'অপদার্থ' বা 'অপরাধী' মানুষরাও সমাজের নির্মমতার শিকার। তাদের আচার-আচরণ বা অপরাধের পেছনে লুকিয়ে থাকে গভীর হতাশা এবং এক ধরনের অব্যক্ত প্রতিবাদ। বলাইয়ের গল্প কেবল একজন নেশাখোরের গল্প নয়, বরং এটি প্রান্তিক মানুষের আত্ম-মর্যাদা রক্ষার এক নীরব লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে তাদের কণ্ঠস্বর দিয়েছেন, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও প্রতিরোধকে সম্মান জানিয়েছেন, যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনেও থাকে জটিলতা, আবেগ, এবং প্রতিরোধের আগুন, যা প্রচলিত সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কেবল তুলে ধরেননি, বরং তাদের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি ও মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। বলাইয়ের মতো চরিত্রগুলোকে তিনি তাদের ব্যর্থতা বা অপরাধ দিয়ে বিচার করেননি, বরং তাদের ভেতরের মানবিকতা ও আত্ম-মর্যাদার লড়াইকে তুলে ধরেছেন। 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে বলাইয়ের খোঁড়াবাবুর গোলায় আগুন দেওয়াটি কেবল একটি প্রতিশোধ নয়, বরং সমাজের শোষক শ্রেণির প্রতি প্রান্তিক মানুষের চাপা রাগ ও প্রতিরোধের প্রতীকী বিস্ফোরণ। বলাইয়ের এই কাজটি প্রমাণ করে যে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষটিও তার আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করতে পারে, যদিও সেই প্রতিবাদ হয়তো সহিংস বা বেপরোয়া।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য এই বার্তা দেয় যে, তথাকথিত 'প্রান্তিক' মানুষরাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের গল্প, দুঃখ, ও প্রতিরোধকে বাদ দিয়ে সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। তাই তার নির্বাচিত ছোটগল্পগুলো কেবল সাহিত্যিক মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ নয়, বরং সমাজের অবহেলিত মানুষের জীবনচিত্র হিসেবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনেও থাকে জটিলতা, আবেগ, এবং প্রতিরোধের আগুন, যা প্রচলিত সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দেয়।

তথ্যসূত্র:

১। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৬০৪।
২। তদেব, পৃ. ৬০২।
৩। তদেব, পৃ. ৬০৬।
৪। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ২ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৮।
৫। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৬৭।
৬। তদেব, পৃ. ২১৩।
৭। তদেব, পৃ. ২১৩।
৮। তদেব, পৃ. ২১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২।

২। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ২ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে। পুস্তক বিপণি, ২০০৫।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬।

৫। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। কল্লোল যুগ। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬।

৬। ঘোষ, বিনয়। মেট্রোপলিটন মন: মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ। প্রথম দীপ সংস্করণ: প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০২০।

৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২।